e-paper

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৬, সংখ্যা: ৪ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | জুলাই ২০১৫

জানা অজানা

৭০ ডিগ্রিতেও পরোয়া নেই

সাহারা মরুভুমি মোটেই সুখের জায়গা নয়। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বালি গরম হতে থাকে। সূর্য যখন মধ্যগগনে পৌঁছয়, পায়ের তলার মাটির তাপ তখন ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গিয়ে ঠেকে। আকাশ থেকে সেই অগ্নিবৃষ্টির সময় কোনও প্রাণী বাইরে আসে না। বালির তলায় ছোটখাটো গর্তের মধ্যে দুপুরের বিষম সময়টা তারা চুপচাপ শুয়ে বসে কাটিয়ে দেয়। অথচ ঠিক তখনই, বালির তলা থেকে মাথা তুলে এক এক করে গনগনে বালির ওপর উঠে আসে এক দল পিঁপড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সেটাই তাদের খাবার সংগ্রহ করার সময়। সাহারার বালির জগতে খাদ্যের বিশেষ বৈচিত্র নেই। মৃত প্রাণীদের দেহাবশেষ থেকেই খাবার খোঁজে তারা। প্রায় ৭০ ডিগ্রি গরম বালির ওপর চলে বেড়ায়। ওদের পা পোড়ে না, ঝলসে যায় না শরীর। কী করে তা সম্ভব হয়?

উল্লেখ করা যেতে পারে তারা যে-সে পিঁপড়ে নয়। রূপলি পিঁপড়ে বলে তারা পরিচিত। সাহারার সোনালি বালিতে যেন মিশে থাকে রূপোর কুচি। তাদের ওই বিস্ময়কর ক্ষমতার রহস্য সন্ধানে গবেষণা শুরু করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোম্বিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং আর জার্মানির

এবার ৩ পাতায়

নতুন বিলুপ্তির যুগ শুরু হয়ে গেছে

স্বাভাবিকের থেকে ১১৮ গুণ বেশি হারে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে মেরুদন্ডী প্রাণী

বিজ্ঞানীরা বলছেন পৃথিবী এখন এক নতুন বিলুপ্তির যুগে প্রবেশ করেছে। এই যুগ কবে শেষ হবে তা জানা নেই। তবে যেদিনই শেষ হোক না কেন, তার আগে যে এই গ্রহের হাজারও প্রাণী চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে সে ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত। আর তার ফলে মানুষের অস্তিত্বও এক গভীর সঙ্কটে পড়বে বলেই জানিয়েছেন তাঁরা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এক সঙ্গে অনুসন্ধান চালানর পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। স্ট্যানফোর্ড, প্রিন্সটন আর বার্কলের মত প্রথমসারির তিন ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এখন যে হারে মেরুদন্ডী প্রাণী পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তা স্বাভাবিকের থেকে ১১৪ গুণ বেশি। "আমরা এখন ষষ্ঠ মহাবিলুপ্তির যুগে প্রবেশ করেছি," বলেছেন ওই বিজ্ঞানীদের একজন। গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরাও ঠিক একই কথা বলেছিলেন তাঁদের গবেষণা শেষে।

বলা হচ্ছে, এ ভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীর প্রাণী জগতে যে বিপুল ক্ষতি হবে তা পূরণ হতে লেগে যাবে কয়েক লক্ষ বছর। আর তার অনেক আগেই এই গ্রহ থেকে একটু একটু করে মুছে যাবে মানুষও। হয়ত, যেমন গিয়েছে ডোডো পাখি (**ছবি**)।

বিপন্ন পৃথিবী

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ১৯০০ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত চারশো-র বেশি মেরুদন্ডী প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মাত্র ১১৫ বছরে যে বিলুপ্তি ঘটেছে, পৃথিবী যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকত তাহলে তা হতে সময় লাগত ১০,০০০ বছর, বলেছেন বিজ্ঞানীরা। আর তার জন্য তাঁরা দায়ী করছেন পরিবেশ দূষণ, আবহাওয়া পরিবর্তন এবং বন ধ্বংসকে, যার পেছনে রয়েছে মানুষেরই হাত।

মনে করা হচ্ছে মানুষের আর তিন পুরুষের মধ্যেই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেবে মৌমাছি, যাদের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে মানুষের খাদ্য উৎপাদন। ওই ক্ষুদে প্রাণীটি গাছে গাছে উড়ে বেড়িয়ে পরাগ মিলন ঘটিয়ে ফুল ফল ফলায় যার থেকে আসে মানুষের খাদ্যের একটা বড় অংশ। মৌমাছিরা বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কে করবে? মানুষের খাবার জোগায় এমন গাছ ছাড়াও তো হাজারও অন্য গাছ আছে যাদের ওপর নির্ভর করে তৃণভোজী প্রাণীরা। পরাগ মিলন না ঘটলে তাদের খাদ্য ভান্ডারেও তো টান পড়বে। বিপন্ন হবে তারা। আর সেভাবে গোটা জীবচক্রই হারাবে তার ভারসাম্য। সেই সঙ্কট থেকে সামলে ওঠার কোনও উপায় বিজ্ঞানীরা এখনও দেখতে পাচ্ছেন না।

"আসলে যে ডালে বসে আছি, সেই ডালই আমরা কেটে চলেছি," আক্ষেপ করে বলেছেন এই গবেষণার এক বিজ্ঞানী পল এহরলিখ।

সূত্রঃ বিবিসি

বিশ্বে কমছে, উগান্ডায় বাড়ছে

বিশ্ব জুড়ে বাঘ, সিংহ, গন্ডার, এমনকী হাতিরও সংখ্যা যখন কমছে, তখন উগান্ডায় হাতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এবং ২/৫ টা করে নয়, একেবারে ৬০০ শতাংশ। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্ট বলছে আশির দশকেও সেখানে হাতির সংখ্যা নেমে গিয়েছিল ৭০০/৮০০ তে। বর্তমানে বেড়ে তা হয়েছে ৫০০০। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, গ্রেট

এলিফেন্ট সেনসাস এবং উগান্ডা ওয়াইল্ডলাইফ অথারিটি সম্মিলিতভাবে একটি সমীক্ষা চালায়। গত মে মাসে প্রকাশিত তারই রিপোর্ট থেকে এই তথ্য জানা যাচ্ছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত সহ অনেক দেশেই হাতি খুবই বিপন্ন। সেখানে তাদের এই বৃদ্ধি তো অবশ্যই আশা ব্যঞ্জক। কিন্তু এই সাফল্য এল কী ভাবে? পূর্ব আফ্রিকায় এক

এবার ২ পাতায়

শকুনের বাসা

ভারতে শকুন এখন এক বিরল প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। আগে যেখানে শকুনের ঝাঁক দেখা যেত, এখন তাদের প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। তাই তাদের সংখ্যা বাড়ানর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। তেমনই এক প্রয়াস চলেছে কেরল রাজ্যে। সেখানে প্রচুর নারকেল। সেখানে নারকেলের বাগিচা তৈরি করে বহু মানুষ জীবিকা অর্জন করেন। সম্প্রতি দেখা গেছে যে কিছু কিছু নারকেল গাছে শকুনরা বাসা বাঁধছে। চাষিদের বলা হয়েছে বাসাগুলির যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সে দিকে নজর রাখতে। এ কাজের জন্য চাষিদের বাসাপিছু ৪০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।

পাঞ্জাবে ঘড়িয়াল

ঘড়িয়ালরা আসবে পাঞ্জাবে। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে অন্য জায়গা থেকে তাদের নিয়ে এসে শতদ্রু আর বিয়াস নদীতে ছাড়তে হবে। তার ফলে প্রাণীগুলি নতুন বাসস্থান পাবে আবার বেড়াতে আসা মানুষজনের কাছে তারা এক বিশেষ আকর্ষণও হয়ে উঠবে। কুমিরের মত দেখতে এই প্রাণীটি এখন বিপন্ন। তাদের বাঁচানর চেষ্টা চলছে সারা দেশে।

সূত্রঃ প্রোটেকটেড এরিয়া আপডেট

চাঁদমামা এলেন কোথা থেকে?

চাঁদকে আমরা আমাদের মামা বলেই জানি। কিন্তু আকাশে ভেসে-থাকা আমাদের ওই মামা কবে, কখন, কোথা থেকে এলেন তা আমাদের জানা নেই। মহাকাশে আমাদের নিকটতম আত্মীয়টি তাই এখনও রহস্যে ঘেরাই থেকে গেছেন, যদিও ১৯৬৯ সালে, মহাকাশযানে চেপে পৃথিবীতে তাঁর অগনিত ভাগ্নেদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন। মনে করা হয়েছিল এবার বুঝি মামার জন্ম রহস্য ভেদ করা যাবে। কিন্তু কোথায় কী! আকাশ থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে এখনও রোজ রাতে মুচকি মুচকি হাসেন উনি।

চাঁদ চিরকালই মানুষকে ভাবিয়েছে – অতীতে এবং আজও। পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক এতটাই নিবিড় যে তাঁর টানে নদী, সাগর, মহাসাগরে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। অনেক প্রাণীর জীবনচক্র জড়িয়ে আছে পূর্ণিমা আর অমাবস্যার সঙ্গে। আবার কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন মানুষের ঘুমের ওপরও প্রভাব ফেলে চাঁদের পরিক্রমা।

সেই প্রাচীন কাল থেকেই চাঁদকে জানা, বোঝার চেষ্টা করেছে মানুষ। কিন্তু খালি চোখে কতটাই বা জানা সম্ভব ছিল! গ্যালেলিও ১৬০০ খৃস্টাব্দের শুরুর দিকে আবিষ্কার করলেন এক শক্তিশালী টেলিস্কোপ, যা খুব কাছে এনে দিল চাঁদকে। দেখা গেল, চাঁদ অনেকটাই পৃথিবীর মত – বিস্তৃত সমতল, কোথাও বা পাহাড়ের সারি, কোথাও গভীর গহ্বর। সেই থেকে ধারণা হল পৃথিবী আর চাঁদ একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা

বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের ছেলে জর্জ ডারউইন ১৮০০ সালে এক তত্ত্ব খাড়া করেন। তিনি বলেন পৃথিবীর সৃষ্টি কালে আমাদের এই গ্রহটি এতোই প্রবল বেগে ঘুরছিল যে তার তখনও-তরল অঙ্গ থেকে একটা বড় অংশ ছিটকে যায়, আর তা থেকেই তৈরি হয় চাঁদ। তাঁর মতে ছিটকে যাওয়া অংশের শূন্যস্থানেই জায়গা করে নেয় প্রশান্ত মহাসাগর। এই তত্ত্ব বিজ্ঞানী মহলে বেশিদিন সমাদৃত হয় নি। উপগ্রহ হিসেবে চাঁদ খুব বড়। চাঁদের আকৃতির সমান কোনও চাঙ্গড় যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকত তাহলে তো পৃথিবীর আয়তন অনেক ছোট হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শোনা যায় আরও এক সম্ভাবনার কথা। হ্যারল্ড উরে নামক এক যৌগবিজ্ঞানী বলেন চাঁদের আবির্ভভাব হয়েছিল গ্রহান্তর থেকে। অর্থাৎ, অন্য কোনও নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে ভেসে এসে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে বাঁধা পড়ে যায় চাঁদ। কিন্তু চাঁদের মতো বিরাট কোনও উপোগ্রহ মাহাকাশে যদি ধেয়ে এসে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে পড়ে যেত, তাহলে আকাশে ভেসে থাকার বদলে তা তো পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ত। উরে সে সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেন। বলেন, পৃথিবীর বায়ুমন্ডল রক্ষাকবজের মতো কাজ করেছিল। তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অন্য দিকে সরে যায় ধেয়ে আসা চাঁদ।

কিন্তু সব তত্ত্বই বাতিল হয় চাঁদের পাথরের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলো চন্দ্র অভিযানের মহাকাশচারিরা ১৯৭০ দশকে চাঁদ থেকে তুলে এনেছিলেন সেখানকার পাথরের নমুনা। সেই থেকে চলছে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

দেখা গেছে পৃথিবীর মৌলিক পদার্থগুলির সঙ্গে চাঁদের পদার্থগুলির ভীষণ মিল। তাহলে কি পৃথিবীর এক ছিটকে যাওয়ার অংশ থেকেই চাঁদের উৎপত্তি? অবশ্য তাদের মধ্যে কিছু বিশেষ অমিলও দেখা গেছে, যার ফলে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায় নি এখনও।

অতএব চাঁদমামা কোথা থেকে এলেন, সে রহস্য থেকেই যাচ্ছে।

অনীশ গুপ্ত

সূত্রঃ বিবিসি

---

১ পাতা থেকে

সময়ে প্রচুর হাতি ছিল। কিন্তু চোরা শিকারিদের হাতে নির্বিচারে নিহত হতে হতে তাদের সংখ্যা তলানিতে পৌঁছে যায়। তখন কনজারভেশন সোসাইটি উগান্ডার দশটি জাতীয় উদ্যানে খুব কড়া নজরদারিতে হাতিদের সংরক্ষণ করার চেষ্টা চালায়। এবং তাদের সংখ্যা বাড়ার পেছনে এটা একটা বড় কারণ।

আসলে রাজনৈতিক সমস্যাদীর্ণ উগান্ডায় যথেচ্ছ

চোরাশিকারের ফলে বন্যপ্রাণীদের জীবনও খুবই সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে গেছে। সেখানকার বর্তমান সরকার এখন অবশ্য বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ সেখানকার পর্যটন শিল্পে বন্যপ্রাণীরা যে শুধু বড় ভূমিকা নেয় তাই নয়, সব থেকে বেশি বিদেশি মুদ্রা উপার্জনেও সরকারকে তারা সাহায্য করে। এছাড়া সরকার নতুন একটি ‘বন্যপ্রাণ অপরাধ শাখা’ খুলেছে। হাতির দাঁত পাচার নিয়ন্ত্রণ করতে বিমান বন্দরগুলিতেও নজরদারি বাড়িয়েছে। মোটকথা বেশ কড়া হাতে এই অপরাধ দমনের চেষ্টা করছে সরকার। এবং সেই চেষ্টার ফলেই এই সাফল্য বলা যেতে পারে।

মেরিন ইগুয়ানা

শুধু গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জেই তাদের দেখা যায়। পৃথিবীতে এরাই একমাত্র গিরগিটি জাতীয় প্রাণী, সমুদ্র যাদের বাসস্থান। সাধারণত কালো ও ধূসর রঙের হয়। তবে প্রজনন কালে পুরুষ ইগুয়ানাদের গায়ের রঙ বদলে সবুজ ও লাল হয়ে ওঠে। সমুদ্রের জলের নীচে দীর্ঘক্ষণ ডুবে থাকতে পারে তারা। তাদের মূলত খাদ্য অ্যালগি বা এক ধরনের সামুদ্রিক শ্যাওলা। আর তারা খাদ্য হয় ওঠে বাজ, প্যাঁচা, সাগরপাখি এবং ইঁদুর বেড়াল ও কুকুরদের। দুই থেকে সাড়ে পাঁচ ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়। সাত প্রজাতির মেরিন ইগুয়ানা গ্যালাপাগোসে দেখা যায়, যারা রঙে ও আকৃতিতে আলাদা। তবে তারাও এখন বিপদ সম্মুখীন। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা তাদের জীবনেও এসে লাগছে।

খাবারের খোঁজে ঝলসানো দুপুরে

১ পাতা থেকে

জুরিখ ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানী-রা। তাঁরা দেখেন ওই পিঁপড়েদের শরীর ঢাকা থাকে খুব ছোট ছোট চুল দিয়ে যাদের থাকে উত্তাপ প্রতিহত করার বিশেষ ক্ষমতা। সূর্যের রশ্মি যে তাপ সৃষ্টি করে, ওই চুল তা আটকে দেয়। আবার বালি থেকে ছড়াতে থাকা তাপও বাধা পায় ওই চুলের কাছে। ফলে, পিঁপড়েরা রক্ষা পায় সাহারার উত্তাপ থেকেও।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন গরম প্রতিহত করে তাকে সহনসীমার মধ্যে রাখার এ এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা। কিন্তু ওই রূপলি পিঁপড়েরা মাঝদুপুরের ঝলসানো গরমে খাবারের সন্ধানে না বেরিয়ে পড়ন্ত বেলায় তো সে কাজ অনায়াসে করতে পারত? বিজ্ঞানীরা বলছেন তেমনটা করলে খাবার খুঁজে বেড়ানর বদলে তারা নিজেরাই খাবার হয়ে যেতে পারে। কারণ দিনের ওই সময়টুক অন্য সব শিকারি প্রাণীরা গরমের ঠেলায় নিজেদের আস্তানায় গা ঢাকা দিয়ে থাকে। তাই শিকারিবিহীন ওই কয়েক ঘন্টাই পিঁপড়েদের খাবারের সন্ধানে বেরনর সব থেকে নিরাপদ সময়। তাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করেছে।

সূত্রঃ সায়েন্স ডেইলি

এতোই ভারি কাঠ যে জলে ডুবে যায়

কাঠ এমনিতে জলে ভাসে কিন্তু মরুভূমির আয়রনউড জলে ডুবে যায়। কারণ, এই গাছের কাঠের ঘনত্ব এতোই বেশি এবং সেই কাঠ এতোই ভারি যে একটুকরো জলে ফেললে আক্ষরিক অর্থেই তা ডুবে যায়। সে এমনই গাছ যার ফল মরুভূমির পাখি ও নানান স্তন্যপায়ীদের জীবনধারণের জন্য একেবারে অপরিহার্য। এবং মরুভূমির প্রায় ৫০০ রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে সে। এমনকী আমেরিকার আদিম

জনজাতি, যারা একদা মরুভূমিতেই বাস করত, তাদেরও নির্ভর করতে হত ওই গাছের শুঁটি জাতীয় ফলের বাদামি দানাগুলির ওপরই।

এই আয়রনউড একমাত্র মেক্সিকোর সনোরান মরুভূমি, ক্যালিফর্নিয়া ও অ্যারিজোনায় দেখা যায়। মরুভূমির রুক্ষ কঠীন ও অসহনীয় উত্তপ্ত পরিবেশে এই আয়রনউড গাছেদের ছায়াই মরূদ্যানের শীতল পরিমন্ডল গড়ে তোলে। এবং তার পাতারা এতো ঘন যে, তা ভেদ করে প্রখর তাপও তার নীচের ছায়াকে উষ্ণ করে তুলতে পারে না। দেখা গেছে সেখানকার বাতাসের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্র থেকে অন্তত ১৫ ডিগ্রি কম থাকে। বিজ্ঞানীরা এই আয়রনউডকে সনোরান মরুভূমির খুব প্রাচীন গাছ বলে মনে করছেন। সেখানে এই গাছেদের কারও কারও বয়স ৮০০ র বেশি। আবার এমন কেউ কেউ রয়েছে যারা ১৫০০ বছরেরও বেশি বয়েসি। জানা যাচ্ছে ওষধি গুণেও এই গাছ অনন্য।

সূত্রঃ লাইভসায়েন্স.কম

৬০০০ বছর আগে থেকেই অলিভের চাষ হচ্ছে

জেনে রাখা ভাল

খুব প্রাচীন কাল থেকেই অলিভ'র ব্যবহার নানা ভাবে হয়। শুধু বিদেশে নয় আমাদের দেশেও বিভিন্ন খাদ্যে শরীরে পক্ষে খুবই উপকারী অলিভ অয়েল'র ব্যবহার হচ্ছে। ওষুধ, প্রসাধনী দ্রব্যেও ব্যবহার হয়। আরও জানা যাচ্ছে -

● অলিভ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের গাছ। অন্তত ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই এর ব্যবহার যে হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বি প্রমান সেটা বলছে।

● ঐতিহাসিক তথ্যও মিলেছে যে অলিভ অয়েলের ব্যবহার শুধু খাওয়ার জন্য নয়, ওষুধ, সাবান, ত্বকের যত্নে এমনকী ল্যাম্পের জ্বালানি হিসেবেও তার ব্যবহার হত।

● অলিভ অয়েল তৈরির জন্য অলিভ চাষ করা হয়। প্রথম দিকে তা হাতে করেই তোলা হত। এখন অবশ্য বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে অলিভ তোলা হয়।

● অলিভ অয়েলের বেশির

ভাগই উৎপাদন হয় ইউরোপের স্পেনে। তারপর ইটালি, গ্রিস'এ।

● মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অলিভ অয়েল তৈরি হয় ক্যালিফর্নিয়া, অ্যারিজোনা, টেক্সাস, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, অরেগাঁও এবং হাওয়াই'এ।

● নানা রকমের অলিভ হয়। এবং অলিভ অয়েল তৈরির সময় সেই বহু ধরনের অলিভই ব্যবহার করা হয়।

● এখন অলিভ অয়েলের গুণ ও স্বাদ কেমন হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে, ওই তেল প্রস্তুত করতে যেসব অলিভ ব্যবহার করা হয় সেটি কোন জাতের অলিভ এবং তা কতটা পরিপক্ব হয়েছে-এই দুটি প্রধান বিষয়ের ওপর।

● দেখা গেছে ক্ষেত থেকে অলিভ তোলার পর থেকে ২৪ ঘন্টা আগেই যদি তা থেকে তেল তৈরি করে ফেলা যায় তাহলে তা একেবারে সর্বোৎকৃষ্ট হয়।

● আর 'ভার্জিন অলিভ অয়েল' মানে যাতে কোনও কেমিকেল বা রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার হয় নি।

সূত্রঃ নিউজওয়াইজ.কম

কলকাতায় এত পুকুর আছে জানাই ছিল না

আমরা কি জানি কম বেশি ৫০০০ পুকুর আছে কলকাতায়? হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য। তবে তাদের মধ্যে অনেকে এই ইঁট কাঠের জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। এবং রোজই কোথাও না কোথাও তাদের কেউ না কেউ নিখোঁজ হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য কেউ কেউ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইতে জিতেও যাচ্ছে। তবে যারা আছে, তারা বয়েসে অনেকেই কিন্তু কলকাতার থেকেও বড়। আর কি সব নাম তাদের! কেউ গলাকাটা পুকুর তো কেউ রঘু ডাকাতের পুকুর। কেউ পাগলা পিরের পুকুর তো কেউ আবার লাল দিঘি, কমলা দিঘি, বিমলা দিঘি। এবং এই সব পুকুর ও দিঘির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে কোনও না কোনও লোক-কাহিনি কোনও না কোনও ইতিহাস। জড়িয়ে আছে পরিবেশ, জড়িয়ে আছে সমাজ জীবন। যার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছে ওই 'পাঁচ হাজার আয়নায়'। কীভাবে - সেই ইতিহাস খুঁড়ে তারই উন্মোচন ঘটিয়েছেন মোহিত রায়, তাঁর 'কলিকাতা পুকুর কথা, পরিবেশ ইতিহাস সমাজ' বইটিতে।

পুকুর মানেই জল। আর জল মানেই তাতে চান করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচার মতো প্রাত্যহিক আবশ্যিক কাজ কর্ম। এবং কোথাও কোথাও মাছের চাষও। কিন্তু পুকুর মানে যে আরও অনেক কিছু। পুকুর মানে যে তার পাড়ে নিম, বট, অশ্বত্থ, কদম, বকুল, অর্জুন, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, আম, জাম, পেয়ারা, নারকেল, সুপারি ইত্যাদি গাছেদের ডালপালা থেকে চুইয়ে নেমে আসা শীতলতা। পুকুর মানে যে আকন্দ, কলাবতী, নয়নতারা, কামিনী, কাঞ্চন, শেফালি, চাঁপা, গন্ধরাজ ফুলেদের সমারোহ। পুকুর মানে তো তুলসী, থানকুনী, নিসিন্দা, তেলাকুচা, হিংচে, কলমি, ধুতুরা, কাঁটানটে, বনতুলসী ইত্যাদির মতো অজস্র বনৌষধির জড়াজড়ি সহাবস্থানও। নাহ্ এখানেই শেষ নয়, পুকুর মানে তার আসপাশে মাছরাঙা, ফিঙে, হাঁস, জলপিপি, পানকৌড়ি, টিয়া, বক, কোঁচবক, চিল, কোয়েল, দোয়েল, পাপিয়া, গোশালিক, বুলবুল, ছিঠেঘুঘু, কণ্ঠিঘুঘু ইত্যাদি অসংখ্য পাখিদেরও যে সমাবেশ। এবং পুকুর মানে তার ঝোপঝাড়ে পাড়ের মাটিতে প্রজাপতি, ইঁদুর, কাঠবেড়ালী, বনবিড়াল, নেউল, ভাম, ব্যাঙ, শামুক, সাপেদেরও তো বসবাস। এর বাইরেও পুকুরের চারপাশে থাকে জানা অজানা অসংখ্য কীট-পতঙ্গ।

চেনা-অচেনা কলকাতা

বিস্মিত হতে হয় না যে, পুকুর মানে এত কিছু! প্রাণের এমন বিপুল বৈচিত্র্য! কিন্তু সেই জীবনের সব স্পন্দন তো থেমে যায় একটি পুকুরের মৃত্যু ঘটলেই। যে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিঘাত এসে লাগে স্থানীয় পরিবেশে, বাসিন্দাদের জীবনে। এবং যার প্রভাবের শিকার হতে থাকি আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।

মালবী গুপ্ত

নেড়িদের বনবাস আর নয়, বুঝেছেন বড়বাবুরা

শহরের বেশির ভাগ সম্ভ্রান্ত বাসিন্দারা নেড়ি কুকুরদের পছন্দ করেন না। সুযোগ পেলেই তাদের 'উৎপাতের' বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকে দিয়ে আসেন পুরসভায়। ফলে ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। এখন অবশ্য নেড়িদের বন্ধুদের সংখ্যাও বেড়েছে। পুরসভা অভিযান শুরু করলে তাঁরাও বিষম হৈচৈ করে নেমে পড়েন পাল্টা অভিযানে। তাই দু'চার দিন বেপাত্তা থাকার পর আবার পাড়ায় ফেরে নেড়িরা।

কিন্তু মধ্যপ্রদেশের সাগর শহরে তাদের কপালটা নেহাৎ খারাপই ছিল। নগরবাসি বেশ এককাট্টা হয়েই ২০০৪ সালে তাদের বিরুদ্ধে কামান দাগে। জনসমর্থন পেয়ে পুরকর্মিরা মহাউল্লাসে একের পর এক নেড়ি পাকড়াও করতে থাকে। অভিযান শেষে ধরাপড়া নেড়িদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২৪! এত নেড়ি কুকুর রাখবে কোথায় পুরসভা? সমাধান অবশ্য পেয়ে যায় তারা। সাগর শহর থেকে ৪০ কিমি দূরেই ছিল এক অভয়ারণ্য। এখনও আছে সেটি। ঠিক হয় সেখানেই নির্বাসনে পাঠান হবে নেড়ির দলকে। সেখানে তারা বাঁচে বাঁচবে, মরে মরবে। যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজ।

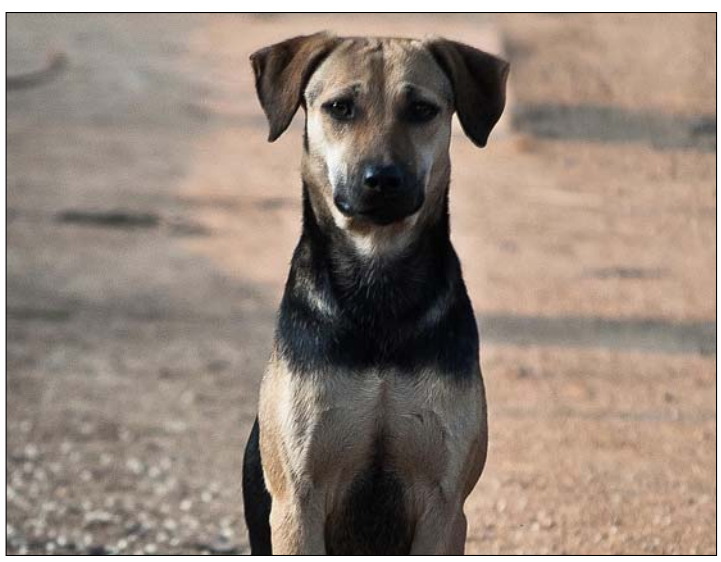

ট্রাক বোঝাই করে এক পাল নেড়িকে ছেড়ে আসা হল জঙ্গলে। ব্যবস্থাটা বেশ মনে ধরেছিল সকলেরই। ফলে শহরে নেড়ির সংখ্যা বেড়ে গেলেই, তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত জঙ্গলে।

কিন্তু আর নয়। পুরসভা তার মত বদলে ফেলেছে। ঠিক হয়েছে নেড়িদের আর বনবাসে পাঠান হবে না। কারণ কি? জানা গেছে শহরের নিরীহ নেড়িরা জঙ্গলে বসবাস করতে করতে বন্য হয়ে উঠেছে। তারা এখন দল বেঁধে শিকার করে। আর তাদের আক্রমনে প্রাণ গেছে ১০ হরিণের। অভয়ারণ্যের প্রাণীদের কাছে, বাঁচার তাড়নায়, শহর থেকে নির্বাসিত নেড়িরা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর থেকে বোঝা যায়, বাবুদের দূরদৃষ্টি পাঁচ গজের বেশি নয়।

সূত্রঃ প্রোটেকটেড এরিয়া আপডেট

গিরেই আটকে ভারতের বিপন্ন পশুরাজ

কথায় বলে পশুরাজ। তার হাঁটাচলা, আচার আচরণ রাজকীয়ই বটে। নিজে সে সাধারণত শিকার করে না । অথচ দলের অন্য সদস্যদের শিকার করে আনা খাদ্যে সেইই প্রথম ভাগ বসায়। হ্যাঁ পাঠকরা ঠিকই ধরেছেন, বলছি সিংহের কথা। আফ্রিকার বাইরে একদা ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশও তাদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। অবশ্য ইউরোপে তারা অনেকদিনই বিলুপ্ত। আর দক্ষিণ - পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক সময় তাদের দেখা গেলেও এখন ভারত ছাড়া আর কোথাও তাদের অস্তিত্ব নেই। তাও দেশের একমাত্র গুজরাটে গির উদ্যান ও অভয়ারণ্যে। এই এশিয়ান লায়নরা পার্শিয়ান লায়ন নামেও পরিচিত ছিল। এরা আফ্রিকার সিংহদেরই জ্ঞাতি ভাই-বোন।

গুজরাটে গিরে যেখানে তাদের বসবাস, এক সময়ে সেটা ছিল রাজাদের মৃগয়া ক্ষেত্র বা শিকারভূমি। মধ্য-প্রাচ্য থেকে একদা ভারতে আগত এই এশীয় সিংহরাও এখন অত্যন্ত বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত। বিপন্ন হয়ে পড়ায় এখন তারা কড়া নজরদারির মধ্যে সংরক্ষিত অঞ্চলে থাকে।

সিংহই একমাত্র বিড়াল প্রজাতির প্রাণী যারা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সেই দল

‘প্রাইড’ নামে পরিচিত। এবং সেই দলে ২/৩ টি পুরুষ সিংহ ও প্রায় ডজন খানেক সিংহী ছানাপোনা সহ বাস করে। সেই দলে প্রায় ৩০/৪০ জন সদস্য থাকে। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে সিংহরা পরে দল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে নিজের আলাদা দল গড়ে। এশীয়রা অবশ্য ছোট ছোট দল বা প্রাইড গড়ে বাস করে যার মধ্যে ২/৪ সিংহী থাকে। এইরকমই কিছু পার্থক্য লক্ষ করা গেছে উভয় মহাদেশের সিংহদের মধ্যে।

বিপন্ন যারা

দেখা গেছে এশীয় সিংহরা আফ্রিকার সিংহদের থেকে আকারে সাধারণত একটু ছোট। লম্বায় এশীয় সিংহরা সাড়ে ৫ ফিট থেকে কখনও কখনও অবশ্য ৮ ফিটও লম্বা হয়। ওজন হয় ১৫০-২৫০ কেজি পর্যন্ত। সিংহীরা দৈর্ঘ্যে সাড়ে ৪ ফিট থেকে ৬ ফিটের মতো, আর ওজন তাদের ১২০-১৮২ কেজির মতো। এশীয়দের কেশরও কম হয় আফ্রিকার সিংহদের থেকে। তারা আফ্রিকান সিংহদের নীলগাই, চিতল হরিণ, বুনো মোষ’র মতো বড় প্রাণীর পাশাপাশি শুয়োর, ছাগলের মতো ছোট খাটো প্রাণীও শিকার করে।

বাঘ যেমন একা একা শিকার করে, সিংহরা কিন্তু দল বেঁধে শিকারের পিছু ধাওয়া করে। অবশ্য শিকার মূলত সিংহীরাই করে। ক্বচিৎ কদাচিৎ সিংহ তাতে অংশ নেয়। কিন্তু শিকার ধরার পর তাতে সিংহ থাবা বসানোর পরে পায় সিংহীরা। চার পাঁচ বছরের মধ্যেই তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ওঠে। সিংহীরা ১-৬ টি বাচ্চা দেয়। কিন্তু তাদের শিশু মৃত্যুর হার বেশ বেশি। ছানারা ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ খেলেও মাংস খাওয়ার হাতে কড়ি তাদের ৩ মাসেই হয়ে যায়। আর মাস নয়’কের মধ্যে শিকার ধরায় তারা হয়ে ওঠে পারদর্শী। এশীয় সিংহরা বাঁচে ১৬-১৮ বছর। আর এশিয়ান সিংহ যেহেতু সবই ওই একটি মাত্র জায়গাতেই আছে তাই তাদের জীবনের ঝুঁকি খুবই বেশি। কারণ যে কোনও রোগ হলে তা মড়কের মতো তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

এক মাত্র গিরেই আরণ্যক পরিবেশে এশীয় সিংহরা আর মাত্র ২০০-২৬০ এর মতো আছে। এই অবশিষ্ট সিংহরাও খুবই হুমকির মুখে। তাদের চামড়ার চাহিদা আছে তিব্বতে। তাই তার সবসময় চোরাশিকারিদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

তাছাড়া অরণ্য সংলগ্ন গ্রামে খাদ্যের জন্য মাঝে মধ্যে হানা দেয় বলে গবাদি পশু বাঁচাতে বাসিন্দাদের হাতেও তাদের মৃত্যু হয়। আর সেই মৃত্যু ঘটাতে গুলি, বিদ্যুতের তার কখনও বা বিষেরও সাহায্য নেওয়া হয়। কে জানে এই প্রতিকূলতার মধ্যে কত দিন আর এশীয় সিংহরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে।

সূত্রঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, ডবলিউডবলিউএফ.পান্ডা.অরজ

সারা বিশ্বে ১১০ কোটি মানুষ পরিশুদ্ধ জল পান না

ডবলিউ. ডবলিউ. এফ

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: July 1, 2015 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● এক জোড়া জিন্‌সের প্যান্ট তৈরি করতে খরচ হয় ২৯০০ গ্যালন জল।

● শুধু আমেরিকাতেই প্রতিদিন হোটেলগুলি থেকে ২০লক্ষ ৬০ হাজার সাবান ফেলে দেওয়া হয় বা বাতিল করা হয়।

● জাপানে যত শিশু আছে তার থেকে বেশি সংখ্যায় সেখানে মানুষের পোষ্য আছে।

● সকালে ও রাতে দাঁত মাজার সময় যদি আমরা কলের মুখটা বন্ধ রাখি তাহলে প্রতিদিন ৮ গ্যালন করে জল আমরা বাঁচাতে পারি।

● পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের ২০% এরও বেশি তৈরি করে অ্যামাজন বর্ষারণ্য।

বাঁ হাতই বেশি চলে

ক্যাঙ্গারুর পেছনের পা দুটি বড়, সামনের দুটি ছোট। সামনের গুলির আকৃতি এমনই যে সেগুলিকে পা বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন দুটি হাত। আর এই মনে হওয়াটা নেহাৎ ভুলও নয়। দেখা যায়, হাঁটা চলার ক্ষেত্রে সামনের ওই পা দুটির বিশেষ ভুমিকা নেই। দৌড়ঝাঁপের সব দায়িত্ব পেছনের বিরাট পা দুটিই পালন করে থাকে। আর সামনের দুটিকে ক্যাঙ্গারুরা ব্যবহার করে হাতের মত।

> ক্যাঙ্গারুদের ক্রিকেট ম্যাচ হলে বাঁ-হাতি খেলোয়াড়দেরই দেখা যাবে

আবার দেখা গেছে যে প্রায় সব ক্যাঙ্গারুরই বাঁ হাত বেশি চলে, যেমন বেশিরভাগ মানুষের চলে ডান হাত। অর্থাৎ, ইডেন উদ্যানে যদি ক্যাঙ্গারুদের টি-২০ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় কখনও, তা হলে বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান আর বোলারদেরই খেলতে দেখা যাবে সে ম্যাচে।

'কারেন্ট বায়োওলজি' জারনালে তাঁদের গবেষণা প্রকাশ করে ক্যাঙ্গারুদেও এই বৈশিষ্ট্যের কথা জানিয়েছেন রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা।

সূত্রঃ সায়েন্স ডেইলি

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট–হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

১। কিসের কথা বলছি?
(ক) বয়েস আড়াই কোটি বছর (খ) ঠিকানা দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়া (গ) দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার (ঘ) গভীরতা ১.৭ কিলোমিটার

২। কোন ভারতীয় ভাষা প্রধানত এই চারটি রাজ্যে ব্যবহার হয়?
(ক) মহারাষ্ট্র (খ) গোয়া (গ) কর্ণাটক (ঘ) কেরল

৩। পর্তুগীজরা ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে গোয়া অধিকার করে; তখন সেখানে কার শাসন ছিল?
(ক) মোঘল (খ) বিজাপুরের সুলতান (গ) ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি (ঘ) মারাঠা পেশওয়া

৪। এই চার ভারতীয় মহিলার খ্যাতি কিসের সঙ্গে জড়িত?
(ক) অরুণিমা "সনু" সিন্‌হা (খ)মালবাথ পূর্ণা (গ) বাছেন্দ্রি পাল (ঘ) প্রেমলতা আগরওয়াল

৫। মশার কামড়ের মাধ্যমে আমাদের রক্তে কি যায় যাতে ম্যালেরিয়া হয়?
(ক) একরকম পরজীবী (খ) কীটনাশক (গ) এক রকম ভাইরাস (ঘ) একটি অ্যাসিড যাতে রক্ত বিষিয়ে যায়

৬। কোন দেশের ইতিহাসে এই সব নগরের নাম পাওয়া যাবে?
(ক) করিন্থ (খ) অ্যাথেন্স (গ) রোডস (ঘ) স্পার্টা

৭। নীচে দুটি প্রাণী একটি পাখি ও একটি অস্ত্রের নাম আছে; কোনটি অন্যদের থেকে আলাদা এবং কেন?
(ক) কোয়ালা (খ) বুমেরাং (গ) ক্যাঙারু (ঘ) কিউই

৮। নীচে চারটি খেলাতে প্রতি দলে ক'জন থাকে? কোনটি ভুল?
(ক) বেসবল-৯ (খ) বাস্কেটবল-৫ (গ) আমেরিকান ফুটবল-১২ (ঘ) ভলিবল-৬

৯। তুলো থেকে তৈরি কাপড় বোঝাতে ইংরেজি শব্দ 'কটন' কোন ভাষা থেকে এসেছে?
(ক) আরবি (খ) ল্যাটিন (গ) চিনে (ঘ) তামিল

১০। ২০০৩ এর বিশ্বকাপে কানাডার বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার ইনিংস টি কেন বিখ্যাত?
(ক) প্রত্যেক ব্যাটসম্যান এল বি ডবলিউ হয়েছিলেন (খ) একটিও সিঙ্গল বা এক রান ছিল না (গ) কানাডার ১০ জন খেলোয়াড় বল করেছিলেন (ঘ) জেতার জন্য ৩৭ রান দরকার ছিল, শ্রীলঙ্কা ২০ মিনিটেরও কম সময়ে তা করে ফেলে।

উত্তর:

১/ বৈকাল হ্রদ; ২/ কোঙ্কানি; ৩/খ; ৪/চার জনেই কোনও না কোনও বিচারে ভারতের প্রথম হিসেবে এভারেস্টে'র শিখরে উঠেছেন; ৫/ক; ৬/প্রাচীন গ্রিস; ৭/ঘ এই পাখি নিউজিল্যান্ডেও আছে, কিন্তু বাকি তিনটি কেবল অস্ট্রেলিয়াতে; ৮/গ হবে ১১; ৯/ক; ১০/ঘ

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি মালবী গুপ্তর পক্ষে অনীশ গুপ্ত দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com